টেরোড্যাকটিলের ডিম

বদনবাবু আপিসের পর আর কার্জন পার্কে আসেন না।

আগে ছিল ভালো। সুরেন বাঁড়ুজ্যের স্ট্যাচুর পাশটায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বিশ্রাম করে তারপর ট্রামের ভিড়টা একটু কমলে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় শিবঠাকুর লেনে বাড়ি ফিরতেন।

এখন ট্রামের লাইন ভিতরে এসে পড়ায় পার্কে বসার আর সে আনন্দ নেই। অথচ এই ভিড়ে গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফেরাই বা যায় কী করে?

আর শুধু তাই নয়। দিনের মধ্যে একটা ঘণ্টা অন্তত একটু চুপচাপ বসে থেকে কলকাতার যেটুকু খোলামেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে সেটুকু উপভোগ করা—এ না হলে বদনবাবুর যেন জীবনই বৃথা। কেরানী হলেও কল্পনাপ্রবণ তিনি। এই কার্জন পার্কেই বসে মনে মনে তিনি কত গল্পই ফেঁদেছেন। কিন্তু লেখা হয়ে ওঠে নি কোনদিন। সময় কোথায়? লিখলে হয়তো নামটাম করতে পারতেন এমন বিশ্বাস তাঁর আছে।

অবিশ্যি গল্পগুলো যে সবই মাঠে মারা গেছে তা নয়।

তাঁর পঙ্গু ছেলে বিলটু এখন বড় হয়েছে। সাত বছর বয়স তার। সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ফলে তার অনেকখানি সময় হয় মা'র কাছে না-হয় বাবার কাছে গল্প শুনে কাটে। জানা গল্প, ছাপা গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্প, দেশবিদেশের রূপকথা, উপকথা, প্রায় সবই তার গত তিন বছরে শোনা হয়ে গেছে। কম করে হাজার গল্প। ইদানীং বদনবাবু তাকে রোজ রাত্রে শোবার আগে একটি করে নতুন গল্প বানিয়ে বলেছেন। এ গল্প তাঁর কার্জন পার্কে বসেই বানানো।

কিন্তু গত একমাসে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে অনেকবার। যে-ক'টি গল্প বলেছেন তাও যে তেমন জমে নি তা বিলটুর মুখ দেখেই বোঝা গেছে। তা হবে না-ই বা কেন? একে তো এমনিতেই আপিসে কাজের চাপ, তার উপরে বিশ্রামের জায়গাটির সঙ্গে চিন্তার সুযোগটিও যে লোপ পেয়েছে।

কার্জন পার্ক ছাড়ার পর ক'দিন লালদীঘির ধারটায় গিয়ে বসেছিলেন। ভালো লাগে নি। টেলিফোনের ওই অতিকায় রাক্ষুসে বাড়িটা আকাশের অনেকখানি খেয়ে ফেলে সব মাটি করে দিয়েছে।

তারপরে অবিশ্যি লালদীঘির মাঠেও চলে এসেছে ট্রামের রাস্তা এবং বদনবাবুও বিশ্রামের অন্য জায়গা খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন।

আজ তিনি এসেছেন গঙ্গার ধারে।

আউটরাম ঘাটের দক্ষিণে, রেললাইনের ধার দিয়ে পোয়াটাক পথ গিয়ে এই

বেঞ্চি। ওই দেখা যাচ্ছে তোপের কেল্লা। লোহার শিকের মাথায় বলটা এখনো রয়েছে। যেন কাঠির ডগায় আলুর দম।

বদনবাবুর ইস্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। একটা বাজলেই গুড়ুম করে তোপের শব্দ, আর টিফিনের ছুটি, আর হেডমাস্টার হরিনাথবাবুর ট্যাঁকঘড়ি মেলানো।

জায়গাটা ঠিক নির্জন বলা চলে না। সামনেই নদীতে সার-সার নৌকো বাঁধা আর তার উপরে মাঝিমাল্লাদের কথাবার্তা। দূরে একটা ছাই-রঙের জাপানী জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে। আরো দূরে, খিদিরপুরের দিকটায়, সন্ধ্যার আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাস্তুল আর কপিকলের ঝাড়।

বাঃ, বেশ জায়গা।

বেঞ্চিটায় বসা যাক।

ওই যে শুকতারা, স্টীমারের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আবছা আবছা দেখা যায়।

বদনবাবুর মনে হল যেন অনেকদিন তিনি এতখানি আকাশ একসঙ্গে দেখেন নি। আহা, কী বিরাট, কী বিশাল! এমন না হলে কল্পনার পাখি ডানা মেলে উড়বে কী করে?

বদনবাবু ক্যাম্বিসের জুতোটা খুলে পা তুলে বাবু হয়ে বসলেন।

আজ তিনি, একটা কেন, অনেকগুলো গল্পের প্লট ফাঁদবেন এখানে বসে। এতদিনের অভাব মিটিয়ে নেবেন।

বিলটুর খুশি-ভরা মুখটা তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

'নমস্কার!'

এই রে! এখানেও ব্যাঘাত?

বদনবাবু ফিরে দেখলেন একটি লিকলিকে রোগা লোক, বছর পঞ্চাশেক বয়স, পরনে খয়েরি কোট-প্যান্ট, কাঁধে চটের থলি। সন্ধ্যার ফিকে আলোয় মুখ ভালো বোঝা যাচ্ছে না, তবে চোখের দৃষ্টি যেন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ।

আর ওটা কী? স্টেথোস্কোপ নাকি?

ভদ্রলোকের বুকের কাছে একটি ঝোলায়মান যন্ত্র থেকে দু'টি রবারের নল বেরিয়ে তাঁর কানের মধ্যে ঢুকেছে।

আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন, 'ডিসটার্ব করছি না তো? কিছু মনে করবেন না। আপনাকে এখানে আগে কখনো দেখি নি, তাই...'

বদনবাবু বেজায় বিরক্ত হলেন। বেশ তো নিরিবিলি ছিলাম রে বাপু। কেন মিছে গায়ে পড়ে আলাপ করা? সব মাটি হয়ে গেল। বেচারি বিলটুকে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

মুখে বললেন, 'আগে আসি নি, তাই দেখেন নি আর কি। এত বড় শহরে দেখার চেয়ে না-দেখার লোকের সংখ্যাই বেশি নয় কি?'

আগন্তুক বদনবাবুর শ্লেষ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আমি আসছি আজ চার বছর ধরে, সমানে।'

'ও।'

'ঠিক এইখানে। এই একই জায়গায়। এই বেঞ্চিতে। এটাই আমার এক্সপেরিমেন্টের জায়গা কিনা!'

এক্সপেরিমেন্ট? গঙ্গার ধারে খোলা মাঠে আবার এক্সপেরিমেন্ট কী? লোকটা ছিটগ্রস্ত নাকি?

কিংবা যদি অন্য কিছু হয়? গুণ্ডা-টুণ্ডা জাতীয় কিছু? কলকাতা শহর তো, কিছুই বলা যায় না।

সর্বনাশ! বদনবাবু আজ মাইনে পেয়েছেন। ট্যাঁকে রুমালে বাঁধা দু'খানা কড়কড়ে একশো টাকার নোট। তাছাড়া পকেটে মানিব্যাগে নোট-খুচরো মিলিয়ে পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সা।

বদনবাবু উঠে পড়লেন। সাবধানের মার নেই।

'সে কী মশাই? চললেন? রাগ করলেন নাকি?'

'না, না।'

'তবে? এই তো বসলেন। এর মধ্যেই উঠছেন?'

সত্যিই তো! তিনি এমন ছেলেমানুষি করছেন কেন? ভয় কিসের? ত্রিশ গজ দূরে সামনের নৌকোগুলোতে অন্তত শ-খানেক লোক।

বদনবাবু তাও বললেন, 'যাই, দেরি হল।'

'দেরি? সবে তো সাড়ে-পাঁচটা।'

'অনেকখানি পথ যেতে হবে।'

'কতখানি?'

'সেই বাগবাজারে।'

'আরে রাম রাম। তাও যদি বলতেন শ্রীরামপুর কি চুঁচড়ো—কি নিদেনপক্ষে দক্ষিণেশ্বর।'

'তাও কম কী? ট্রামে করে পাক্কা চল্লিশ মিনিট। তার উপর দশ মিনিটের হাঁটা তো আছেই।'

'তা বটে।'

আগন্তুক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'চল্লিশ প্লাস দশ—পঞ্চাশ। ...আমি আবার মিনিট-ঘণ্টার হিসেবটায় ঠিক অভ্যস্ত নই। আমাদের হচ্ছে...বসুন না! একটুক্ষণ বসে যান।'

বদনবাবু বসলেন।

আগন্তুকের গলার স্বর আর চোখের চাহনির মধ্যে কী জানি একটা আছে যার জন্যে বদনবাবু তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, একেই বোধহয় বলে হিপ্‌নটিজম।

আগন্তুক বললেন, 'আমি যাকে-তাকে আমার পাশে বসতে বলি না। আপনাকে দেখে মনে হল আপনি ভাবুক লোক। কেবলমাত্র টাকা-আনা-পাই-এর হিসেব নিয়ে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন না, যেমন আর নিরানব্বুই পয়েন্ট নাইন রেকারিং পারসেন্ট লোকে থাকে। ...কেমন, ঠিক বলি নি?'

বদনবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে মানে...'

'আপনি বিনয়ীও বটে। সেও ভালো। বড়াই আমি পছন্দ করি না। বড়াই করতে

চাইলে আমার চেয়ে বেশি কেউ করতে পারত না।'

আগন্তুক থামলেন। তারপর কান থেকে নল দুটো খুলে যন্ত্রটা পাশে বেঞ্চির উপর রেখে বললেন, 'ভয় হয়। অন্ধকারে অসাবধানে সুইচে হাত পড়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।'

বদনবাবুর ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন এসে আটকে ছিল, এবার বেরিয়ে পড়ল। —

'আপনার ও যন্ত্রটা কি স্টেথোস্কোপ, না অন্য কিছু?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গেলেন। ভারী অভদ্র তো! উত্তরের বদলে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি লেখেন?'

'লিখি মানে—গল্প?'

'গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক, যা-ই হোক। ব্যাপারটা হচ্ছে ও জিনিসটা আমার ঠিক আসে না। অথচ এত সব কীর্তি, এত অভিজ্ঞতা, এত গবেষণা—এগুলো সব ভবিষ্যতের জন্য লিখে যেতে পারলে ভালো হতো।'

অভিজ্ঞতা? গবেষণা? লোকটা বলে কী?

'পর্যটক ক'রকম দেখেছেন?'

লোকটার প্রশ্নগুলোর সত্যিই কোন মাথামুণ্ডু নেই। পর্যটক একটা দেখারই বা সৌভাগ্য কতজনের হয়?

বদনবাবু বললেন, 'পর্যটক যে একরকমের বেশি হয় তাই তো জানতাম না।'

'সে কী! তিনরকম তো যে-কেউ বলতে পারে। জলচর, স্থলচর আর ব্যোমচর। প্রথম দলে ভাস্কো-ডা-গামা, ক্যাপ্টেন স্কট, কলম্বাস ইত্যাদি। স্থলে হিউয়েন সাং, মাঙ্গো পার্ক, লিভিংস্টোন, মায় আমাদের গ্লোব ট্রটার উমেশ ভট্চাজ্ পর্যন্ত। আর আকাশে—ধরুন, প্রফেসর পিকার্ড, যিনি বেলুনে পঞ্চাশ হাজার ফুট উঠেছিলেন, আর এই সেদিনের ছোকরা গাগারিন। অবিশ্যি এগুলো সবই খুব মামুলি। আমি যে ধরনের পর্যটকের কথা বলছি সেটা জলেও নয়, মাটিতেও নয়, আকাশেও নয়।'

'তবে?'

'কালে।'

'মানে?'

'কালের মধ্যে ঘোরাফেরা। অতীত কালে পাড়ি, আগামী কালে সফর। ইচ্ছেমত ভূতভবিষ্যতে বিচরণ। বর্তমানে তো আছিই, তাই ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।'

এতক্ষণে বদনবাবুর কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বললেন, 'এইচ. জি. ওয়েল্স্-এর কথা বলছেন তো? টাইম মেশিন? সেই যে একটা সাইকেলের মত জিনিসে চেপে একটা হ্যান্ডেল টানলেই অতীত যুগে, আর আরেকটা টানলেই ভবিষ্যতে চলে যায়? সেই যে-গল্পটা নিয়ে একটা বিলিতি বায়োস্কোপ হয়েছিল?'

ভদ্রলোক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'সে তো গল্প। আমি বলছি সত্যি ঘটনা। আমার ঘটনা। আমার অভিজ্ঞতা। আমার মেশিন। কোনো সাহেব-লিখিয়ের মনগড়া গাঁজাখুরি গল্প নয়।'

কোথায় যেন একটা স্টীমারের ভোঁ বেজে উঠল।

বদনবাবু ঈষৎ চমকে হাত দুটোকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে জড়সড় হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ বাদে নৌকোর বাতিগুলো ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না।

ঘনায়মান অন্ধকারে আরেকবার আগন্তুকের মুখের দিকে চাইলেন বদনবাবু। সন্ধ্যার আকাশের শেষ রঙটুকু তাঁর চোখের মণিতে।

আগন্তুক আকাশের দিকে মুখটা তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'হাসি পায়। তিনশো বছর আগে, এইখানে, ঠিক এই বেঞ্চিটার জায়গায়, একটা কুমির ও তার মাথার উপর একটি বক বসে রোদ পোহাচ্ছিল। ওই খড়ের নৌকোটার জায়গায় একটা পাল-তোলা ওলন্দাজ জাহাজের ডেক থেকে এক নাবিক একটি গাদা বন্দুক দিয়ে কুমিরটাকে মারে। এক গুলিতেই কুমির শেষ। বকটি ঝটপটিয়ে উড়ে পালাবার সময় তার একটি পালক খসে আমার পায়ের সামনে পড়ে। এই সেই পালক।'

আগন্তুক থলির ভিতর থেকে একটা ধবধবে সাদা পালক বার করে বদনবাবুর হাতে দিলেন।

'লাল ছিটেফোঁটাগুলো কী ?'

বদনবাবুর গলা ধরে এসেছে।

আগন্তুক বললেন, 'কুমিরের রক্ত খানিকটা ছিটকে বকটার গায়ে পড়েছিল।'

বদনবাবু পালকটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

আগন্তুকের চোখের আলো মিলিয়ে আসছে। গঙ্গার স্রোতে কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল। এখন আর প্রায় দেখা যায় না। জল মাটি আকাশ সব ঘোলাটে একাকার হয়ে আসছে।

'এটা বুঝতে পারছেন কী জিনিস ?'

বদনবাবু হাতে নিয়ে দেখলেন—একটা লোহার ছোট্ট তিনকোণা ফলক, মাথাটা ছুঁচোলো।

আগন্তুক বললেন, 'দু-হাজার বছর আগে, নদীর মাঝামাঝি—ওই বয়াটার কাছ দিয়ে—একটা মকরমুখো জাহাজ বাহারের ফুলকাটা পাল তুলে সমুদ্রের দিকে চলেছে। সওদাগরি জাহাজ বোধহয়। বলিদ্বীপ-টলিদ্বীপ কোথাও বাণিজ্য করতে চলেছে। পশ্চিমের বাতাসে বত্রিশ দাঁড়ের ছপছপানি শুনতে পাচ্ছি এইখান থেকে।'

'আপনি ?'

'হ্যাঁ। আমি না তো কে ? এইখানে—ঠিক এই বেঞ্চিটার জায়গায়—একটা বটগাছের পাশে লুকিয়ে আছি।'

'লুকিয়ে কেন ?'

'বাধ্য হয়ে। এত বিপদসঙ্কুল জায়গা তা তো জানা ছিল না। ইতিহাসের পাতায় তো আর এসব লেখে নি।'

'বাঘ-টাঘের কথা বলছেন ?'

'বাঘের বাড়া। মানুষ। আমার এই কোমর অবধি উঁচু নাকথ্যাবড়া মিশকালো বন্য মানুষ। কানে মাকড়ি, নাকে আংটা, গায়ে উলকি। হাতে তীরধনুক। তীরের ডগায় বিষাক্ত ফলা।'

'বলেন কী ?'

'ঠিকই বলছি। একবর্ণ মিথ্যে নেই।'

'আপনি দেখলেন ?'

'শুনুন-না। বোশেখ মাস। ঝড় উঠল। আদিম ঝড়। এমন ঝড় আর ওঠে

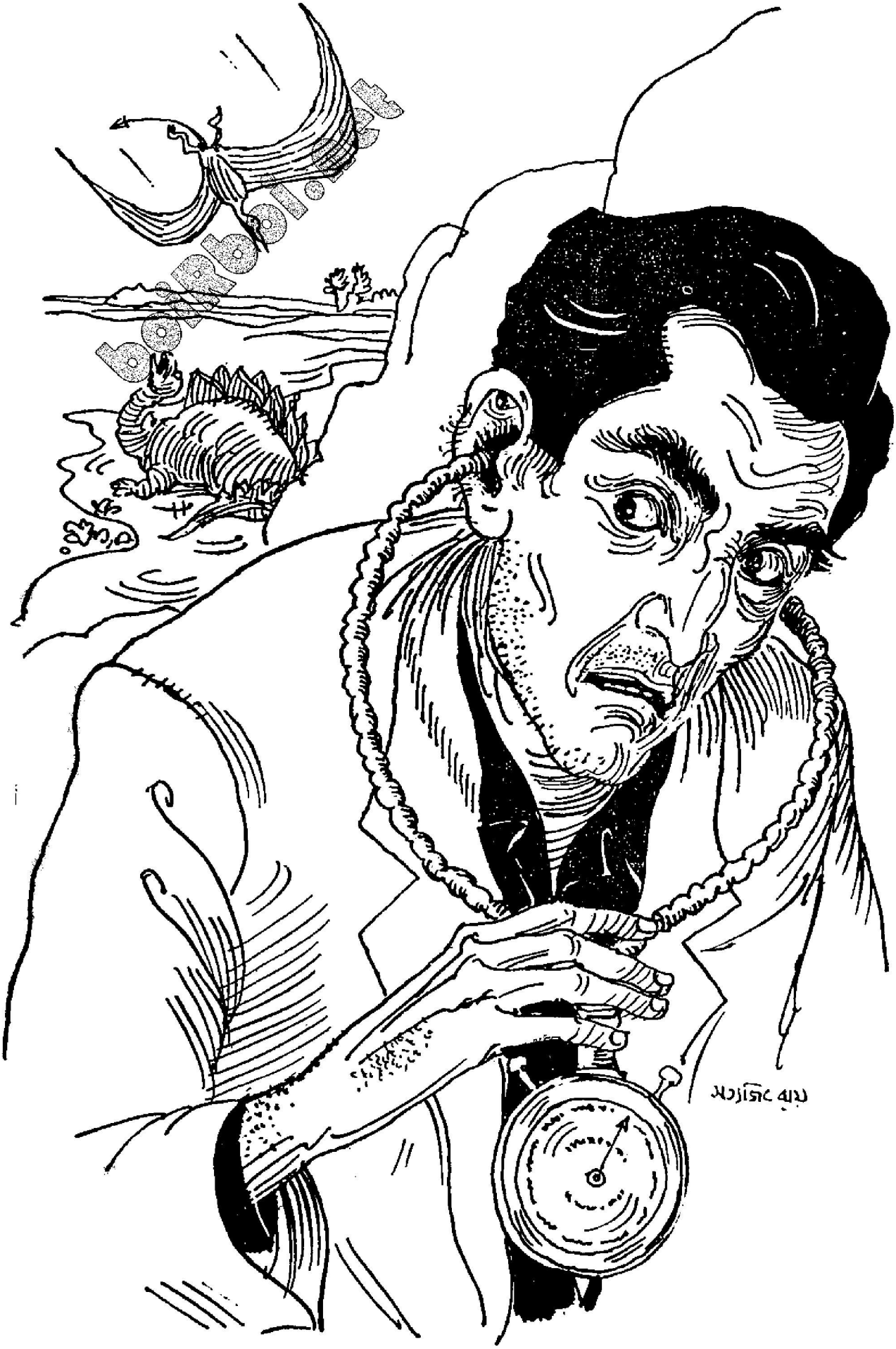

boiRboi.net

না। সেই মকরমুখো জাহাজ চোখের সামনে জলের তলায় তলিয়ে গেল।'

'তারপর ?'

'তার থেকে একটি লোক ভাঙা তক্তায় চেপে হাঙর কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কপালজোরে ডাঙায় এসে—ওরে ব্বাবা !...'

'কী ?'

'সেই বন্য মানুষ তার কী দশা করল সে আপনি নিজের চোখে না দেখলে...অবিশ্যি আমিও শেষ পর্যন্ত দেখতে পারি নি। একটা তীর বটের গুঁড়িটায় এসে বিঁধেছিল। সেইটেকে নিয়ে সুইচ টিপে বর্তমানে ফিরে আসি।'

বদনবাবু হাসবেন না কাঁদবেন না অবাক হবেন তা বুঝতে পারলেন না। ওই সামান্য যন্ত্র আর ওই দুটো নলের মধ্যে এত জাদু আছে নাকি ? এও কি সম্ভব ?

আগন্তুক বদনবাবুর মনের প্রশ্নটা হয়তো আন্দাজ করেই বললেন, 'এই যে দেখছেন যন্ত্রটি—কানের ভিতর নল দুটো ঢুকিয়ে এই ডান দিকের সুইচ টিপলেই ভবিষ্যতে, আর বাঁ দিকের টিপলেই অতীতে চলে যাওয়া যায়। কোন্ যুগের কোন্ সময়টিতে যেতে চান সেটাও এই দাগ-কাটা সন-লেখা চাকার উপর কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নেওয়া যায়। অবিশ্যি বিশ-ত্রিশ বছর এদিক-ওদিক হয়ে যায় মাঝে মাঝে—কিন্তু তাতে বিশেষ এসে যায় না। সস্তার জিনিস তো—তাই অত অ্যাকিউরেট নয় আর কি !'

'সস্তা বুঝি ?' এবার বদনবাবু সত্যিই অবাক।

'সস্তা মানে অবিশ্যি কেবল পয়সার দিক দিয়েই। এর পিছনে রয়েছে পাঁচ হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধি। আজকাল লোকে ভাবে বিজ্ঞানের যত কারসাজি সবই বুঝি পশ্চিমে, এদেশে আর কী হচ্ছে ? আরে বাপু, এদেশে যা হচ্ছে তা কি আর ঢাক পিটিয়ে হচ্ছে ? তা হচ্ছে সব গোপনে, অগোচরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। নাম জাহির করার ব্যাপারটা আমাদের দেশে কোন কালেই ছিল না। এখনও নেই। আসল যারা গুণী তাদের হয়তো দেখাই পাবেন না কোনদিন। দেখুন-না ইতিহাসের দিকে। অজন্তা গুহার ছবি কে বা কারা এঁকেছেন তাঁদের নাম জানেন ? হাজার বছরের পুরনো পাহাড়ের গা থেকে খোদা এলোরার মন্দির কে গড়ল তার নাম জানে কেউ ? ভৈরবী রাগ কার সৃষ্টি ? ঋগ্বেদ লিখল কে ? মহাভারত বেদব্যাসের নামে চলেছে—আর আমরা বলি বাল্মীকির রামায়ণ। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কত শহস্রহস্র নাম-না-জানা লোকের হাত আছে, মাথা আছে তার হিসেব রাখে কেউ ? এই যে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা বড় বড় অঙ্ক কষে ফরমুলা কষে সব বড় বড় আবিষ্কার করে নাম কিনছেন—এই অঙ্কের গোড়ার কথাটা জানেন ?'

গোড়ার কথা ? কী গোড়ার কথা ? বদনবাবু তা জানেন না।

আগন্তুক বললেন, 'শূন্য।'

'শূন্য ?'

'শূন্য। Zero।'

বদনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

'ওয়ান টু থ্রী ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন্ এইট নাইন—জিরো। এই দশটার বেশি আর সংখ্যা নেই। শূন্য—অর্থাৎ ফক্কা। অথচ একের পিঠে শূন্য দিলে হল গিয়ে দশ,

নয়ের এক বেশি। ম্যাজিক! ভাবলে কূলকিনারা পাবেন না। অথচ আমরা মেনে নিচ্ছি। কেন মানছি তাও বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এই ন'টি সংখ্যা আর শূন্য এই দিয়ে রাজ্যির যত অঙ্ক, যত হিসেব, যত ফরমুলা। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ত্রৈরাশিক ভগ্নাংশ ডেসিম্যাল আলজেব্রা এরিথমেটিক ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রনমি, মায় অ্যাটম রকেট রিলেটিভিটি—এর একটিও এই দশটি সংখ্যা ছাড়া হবার জো নেই। আর এই সংখ্যা এল কোত্থেকে জানেন? ভারতবর্ষ। এখান থেকে আরবদেশ, আরব থেকে ইউরোপ এবং তারপর সারা পৃথিবী। বুঝেছেন? এর আগে কী ছিল জানেন?'

বদনবাবু আবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। সত্যি, তাঁর জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ!

আগন্তুক বললেন, 'আগে ছিল রোম্যান কায়দা। সংখ্যা নেই। কেবল অক্ষর। এক হল I, দুই হল II, তিন হল III, কিন্তু চার হয়ে গেল আবার দু' অক্ষর—IV। আর পাঁচ হল এক অক্ষর—V। নিয়মের কোন মাথামুণ্ডু নেই। বাংলায় উনিশশো বাষট্টি লিখতে চার অক্ষর লাগে। আর রোম্যানে কত জানেন?'

'কত?'

'সাত। MCMDCII; বুঝলেন কিছু? আটশো আটাশি লিখতে বাংলার তিন অক্ষরের জায়গায় রোম্যানে কত লাগে জানেন! এক ডজন। DCCCLXXXVIII। এই হারে বিজ্ঞানের বড় বড় ফরমুলা লিখতে বৈজ্ঞানিকদের কী অবস্থা হত ভাবতে পারেন? ত্রিশ পেরোতে না পেরোতে দেখতেন, হয় সব চুল পেকে গেছে না হয় টাক পড়ে গেছে। আর চাঁদে রকেট পাঠানোর ব্যাপারটা তো নির্ঘাত আরো হাজার বছর পিছিয়ে যেত। ভেবে দেখুন, আমাদেরই দেশের একটি অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের আশ্চর্য বুদ্ধির জোরে অঙ্কের ভোল পালটে গেল।'

আগন্তুক দম নেবার জন্য থামলেন।

গির্জার ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ ভেসে আসছে। ছ'টা বাজল।

আলো হঠাৎ বাড়ল কেন?

বদনবাবু পুবদিকে চেয়ে দেখলেন গ্র্যান্ড হোটেলের ছাতের পিছন দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে।

আগন্তুক বললেন, 'আগে যেমন, এখনও তাই। দেশে ঢের লোক আছে যাদের নামধাম কেউ জানেও না, জানবেও না; কিন্তু তাদের বিদ্যেবুদ্ধি পশ্চিমের কোন বৈজ্ঞানিকের চেয়ে একচুল কম নয়। এঁদের সাধারণত কাগজ পেনসিল বইপত্তর ল্যাবরেটরি-ট্যাবরেটরির কোন দরকার হয় না। এঁরা নিরিবিলি চুপচাপ বসে ভাবেন, আর মাথার মধ্যে ভারী ভারী ফরমুলা কষে ভারী ভারী সমস্যার সমাধান করেন।'

আগন্তুক থামতে বদনবাবু মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি কি তাঁদেরই মধ্যে একজন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না। তবে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ বরাতজোরে একবার আমি পেয়েছিলাম। এখানে নয় অবিশ্যি। এ তল্লাটে নয়। জোয়ান বয়সে পায়ে হেঁটে অনেক ঘুরেছি পাহাড়ে-টাহাড়ে। তাদেরই একটাতে। অসাধারণ পুরুষ। নাম গণিতানন্দ। ইনি অবিশ্যি লিখেই অঙ্ক কষতেন। ইনি যেখানে থাকতেন তার আশেপাশে ত্রিশ মাইলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে যতগুলি পাথরের চাঁই ছিল তার প্রত্যেকটির পা থেকে মাথা অবধি অঙ্কের হিজিবিজিতে ভরা। খড়ি দিয়ে লেখা। তাঁর যিনি গুরু, তাঁর কাছ থেকেই গণিতানন্দ অতীত-ভবিষ্যতে বিচরণের রহস্য জানতে

পেরেছিলেন। আমি গণিতানন্দের কাছ থেকেই জেনেছিলুম যে, এভারেস্টের চেয়েও পাঁচ হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের চুড়ো ছিল হিমালয়ে। আজ থেকে সাতচল্লিশ হাজার বছর আগে একটা প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে এই পাহাড়ের অর্ধেকটা নাকি মাটির ভেতর ঢুকে যায়। এবং এই একই ভূমিকম্পে নাকি উত্তর-হিমালয়ের একটি পাহাড়ে ফাটল ধরে তার থেকে একটি ঝরনা বেরিয়ে এই যে নদীটি বয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে, সেটির সৃষ্টি করে।'

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

বদনবাবু চাদরের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'আপনার ওই যন্ত্রটি কি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া?'

আগন্তুক বললেন, 'হ্যাঁ। মানে, ঠিক পাওয়া নয়। উনি উপাদান বলে দিয়েছিলেন। আমি সেই সব মালমসলা সংগ্রহ করে যন্ত্রটি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি। এই যে নলটা দেখছেন, এটা কিন্তু রবার নয়। এটা একরকম পাহাড়ী গাছের ডাল। এই যন্ত্রের একটি জিনিসের জন্যেও আমাকে কোন দোকানে বা কারিগরের কাছে যেতে হয় নি। এর সমস্তই প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি। ডায়ালটায় দাগ কেটে নম্বর বসিয়েছি আমি নিজে হাতে। তবে, নিজের হাতের তৈরি বলেই হয়তো মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। ভবিষ্যতের সুইচটা তো ক'দিন হল কাজই করছে না।'

'আপনি ভবিষ্যতে গেছেন?'

'একবারই। তবে বেশি দূরে না। ত্রিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।'

'কেমন দেখলেন?'

'দেখব কী? এইখানে তখন বিরাট রাস্তা আর আমি একমাত্র মানুষ পায়ে হাঁটছি। এক উদ্ভট গাড়ির তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেস্‌লাম। তারপর আর যাই নি।'

'আর অতীতে কতদূর গেছেন?'

'ওই আরেকটা গোলমাল। আমার এই যন্ত্রে সৃষ্টির গোড়ায় পৌঁছনো যায় না।'

'বটে?'

'না। আমি অনেক চেষ্টা করেও সবচেয়ে পেছন যা গেছি তখন অলরেডি সরীসৃপেরা এসে গেছে।'

বদনবাবুর গলা শুকিয়ে এল। বললেন, 'কী সরীসৃপ? সাপ...?'

'আরে না না। সাপ তো ছেলেমানুষ।'

'তবে?'

'এই ধরুন, ব্রন্টোসরাস, টিরানোসরাস, ডাইনোসরাস, এই সব আর কি।'

'তার মানে আপনি কি ওদেশেও গেছেন নাকি?'

'ওই তো ভুল। ওদেশে কেন? আপনার কি ধারণা এসব জিনিস আমাদের দেশে ছিল না?'

'ছিল নাকি?'

'ছিল মানে? এই ঠিক এইখানটাতেই ছিল। এই বেঞ্চির পাশটাতেই।'

বদনবাবুর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।

আগন্তুক বললেন, 'গঙ্গা নামে নি তখনো। এই সব জায়গায় তখন ছিল

এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিপি, আর লতাপাতা গাছপালার জঙ্গল। সে দৃশ্য ভুলব না। ওই জেটির জায়গাটায় একটা শেওলাভরা ডোবা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। একটা আলেয়া ধক্ করে জ্বলে উঠে মিনিটখানেক দুলে দুলে নিভে গেল। তারই আলোয় দেখলাম দুটো ভাঁটার মত চোখ। চাইনীজ ড্রাগনের ছবি দেখেছেন তো? এও ঠিক তাই। বই-এ ছবি দেখা ছিল। বুঝলাম এই সেই স্টেগোসরাস। কিসের জানি পাতা চিবুতে চিবুতে জলার উপর দিয়ে ছপছপ করে এগিয়ে আসছে। মানুষ খাবে না জানি, কারণ এরা উদ্ভিদ্‌জীবী, কিন্তু তাও দেখি ভয়ে ঢোঁক গিলতে পারছি না। বর্তমানে ফিরে আসার সুইচটা টিপতে যাব, এমন সময় আমার মাথার উপর হঠাৎ একটা ঝটাপট শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি একটা টেরোড্যাকটিল—সে না পাখি, না জানোয়ার, না বাদুড়—জন্তুটার দিকে গোঁত খেয়ে ধাওয়া করে গেল। এ আক্রোশের কারণ বুঝলাম হঠাৎ আমার পাশেই পাথরের ঢিবিটার দিকে চোখ পড়াতে। পাথরের গায়ে একটা বেশ বড় ফাটলে দেখি একটা সাদা গোল চকচকে ডিম। টেরোড্যাকটিলের ডিম। দেখে ভয়ের মধ্যেও লোভ সামলাতে পারলুম না। ওদিকে লড়াই বেধেছে, আর এদিকে আমি দিব্যি ডিমটি বগলস্থ করে নিয়ে...হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।'

বদনবাবুর কিন্তু হাসি পেল না। গল্পের জগতের বাইরে হয় নাকি এসব?

'যন্ত্রটা আপনাকে পরীক্ষা করতে দিতাম, কিন্তু—'

বদনবাবুর কপালের শিরা দপদপ করে উঠল। ঢোঁক গিলে বললেন, 'কিন্তু কী?'

'ফল পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'কে-কেন?'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। লাভ না-হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা তো নেই।'

বদনবাবু গলা বাড়িয়ে দিলেন। জয় মা জগত্তারিণী! নিরাশ কোরো না মা!

আগন্তুক নলের মুখ দুটি বদনবাবুর দু' কানে গুঁজে দিয়ে সুইচটা টিপে খপ করে তাঁর ডান হাতের কবজিটা ধরে ফেললেন।

'নাড়ীটা দেখতে হবে।'

বদনবাবু বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে মিহি গলায় বললেন, 'অতীত, না ভবিষ্যৎ?'

আগন্তুক বললেন, 'অতীত। সিক্স থাউসেন্ড বি. সি.। চোখটা চেপে বন্ধ করুন।'

বদনবাবু অধীর উৎকণ্ঠায় মিনিটখানেক চোখ বুজে বসে থেকে বললেন, 'কই, কিছু হচ্ছে না তো।'

আগন্তুক যন্ত্রটা খুলে নিলেন।

'হবার সম্ভাবনা ছিল কোটিতে এক।'

'কেন?'

'আমার মাথার আর আপনার মাথার চুলের সংখ্যা যদি এক হত তাহলেই আপনার ক্ষেত্রে যন্ত্রটা কাজ করত।'

বদনবাবু ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেলেন। হায় হায় হায়! এমন সুযোগটা এভাবে নষ্ট হল?

আগন্তুক আবার থলির ভেতর হাত ঢোকালেন।

চাঁদের আলোয় এখন চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি?' বদনবাবু কথাটা জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না।

আগন্তুক সাদা গোল চকচকে জিনিসটা এগিয়ে দিলেন।

বেশ ভারী। আর আশ্চর্য মসৃণ।

'দিন। এবার উঠতে হয়। রাত হল।'

বদনবাবু ডিমটা ফিরিয়ে দিলেন। আরো কত অভিজ্ঞতা আছে এঁর কে জানে। বললেন, 'কাল আবার আসছেন তো এইখানে?'

'দেখি। কাজ তো পড়ে আছে অনেক। বই-এ লেখা ঐতিহাসিক তথ্যগুলো তো এখনো কিছুই যাচাই করা হয় নি। কলকাতার গোড়াপত্তনের ব্যাপারটাও দেখতে হবে একবার। চার্নক বাবাজীকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছে এরা। ...আজ আসি। জয় গুরু!'

* * *

ট্রামে উঠেই বদনবাবুকে একটা বাজে অজুহাতে আবার নেমে যেতে হল। কারণ পকেটে হাত দিয়েই তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন।

মানিব্যাগটা উধাও।

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝেছি। যখন চোখ বন্ধ করেছিলাম, আর লোকটা হাত ধরল নাড়ী দেখতে...ইস্, ছি ছি ছি! কী বেকুবই না বনেছি আজ!'

বাড়ি যখন পৌঁছলেন তখন আটটা।

বাবাকে দেখে বিলটুর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে কিন্তু বদনবাবুও অনেকটা হালকা বোধ করছেন।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, 'আজ তোকে একটা ভালো গল্প বলব।'

'সত্যিই তো? অন্যদিনের মত নয় তো?'

'না রে। সত্যিই।'

'কিসের গল্প বাবা?'

'টেরোড্যাকটিলের ডিম। আর তাছাড়া আরো অনেক। একদিনে ফুরোবে না।'

সত্যি বলতে কী, বিলটুর খুশির খোরাক আজ একদিনে যত পেয়েছেন তিনি, তার দাম কি অন্তত পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সাও হবে না?